দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ – ১ নভেম্বর ১৮৭৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। বাংলার আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র অবশ্য মাইকেল প্রবর্তিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পথে না গিয়ে বাস্তবধর্মী সামাজিক নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের নাট্যকারদের আদর্শস্থানীয়।

জন্ম গন্ধর্ব নারায়ণ ১৮৩০ চৌবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু ১ নভেম্বর, ১৮৭৩ ব্রিটিশ ভারত

পেশা নাট্যকার, কবি

জাতীয়তা ভারতীয়

নাগরিকত্ব ব্রিটিশ ভারত

সময়কাল বাংলার নবজাগরণ

ধরন নাটক, কাব্য

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, কমলে কামিনী, দ্বাদশ কবিতা, সুরধুনী কাব্য

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার রায়বাহাদুর

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে। এর পরে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী। এ নাটকটি তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধু মিত্র-এর দুটি উৎকৃষ্ট প্রহসন হলো সধবার একাদশী ও বিয়ে পাগলা বুড়ো। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতাকে উপহাস করে রচিত প্রহসন 'সধবার একাদশী। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে তার অপর এক প্রহসন জামাই বারিক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার সর্বশেষ নাটক কমলে কামিনী। নাটক ছাড়াও দুখানি কাব্যগ্রন্থও দীনবন্ধু রচনা করেছিলেন – দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২) ও সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ – ১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ – ১৮৭৬)।

সাহিত্যকর্ম

নাটক

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক নীলদর্পণ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচিত নাটক। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। এই নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিক ছদ্মনামে। যদিও এই নাটকই তাকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

“ ‘নীলদর্পণ’ নাটক প্রকাশিত হলে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালিমহলে যতটা প্রশংসিত হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গমহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিল। এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, এই নাটক সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়।[৩] ”

মনে করা হয়ে থাকে, নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তবে আধুনিক গবেষকগণ এই বিষয়ে একমত নন।[৪] এই অনুবাদ Nil Durpan, or The Indigo Planting Mirror নামে প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়।

নীলদর্পণ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হল বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। কিভাবে সম্পন্ন কৃষক গোলকমাধবের পরিবার নীলকর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল, তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র; বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুব কমই আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। কর্মসূত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় যে দক্ষতা দীনবন্ধু আয়ত্ত করেছিলেন, তারই এক ঝলক দেখা মেলে এই নাটকের জীবন্ত চরিত্রচিত্রণে।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে হ্যারিয়েট স্টো-এর আঙ্কল টমস্‌ কেবিন গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। তা থেকেই বোঝা যায়, সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজজীবনে এই নাটক কি গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষজনের জীবনকথা এমনই স্বার্থক ও গভীরভাবে নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে যে অনেকেই এই নাটককে বাংলার প্রথম গণনাটক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে এই নাটকই প্রথম জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

যদিও সামগ্রিকভাবে এই নাটকের কিছু আঙ্গিকগত ত্রুটিও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যেমন এই নাটকে চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। বহির্সংঘাতের আধিপত্যে কোনও চরিত্রই বিকাশশীল হয়ে উঠতে পারেনি। নাট্যকাহিনিতেও যথোপযুক্ত জটিলতা না থাকার কারণে নাটকটি দর্শকমহলে তদনুরূপ আগ্রহ ধরে রাখতে পারেনি। সমাজের নিচু তলার বাসিন্দাদের ছবি এই নাটকে অত্যন্ত জীবন্ত হলেও ভদ্রলোক শ্রেণীর চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপ এখানে বড় কৃত্রিম। এছাড়াও ট্রাজেডি রচনায় যে সংযম ও বিচক্ষণতা প্রত্যাশিত, দীনবন্ধু তার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আতিশায্যের আশ্রয় নিয়ে ফেলেন। ফলে নাটকের অনেক অংশই মেলোড্রামাটিক বা অতিনাটকীয়তার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। যার কারণে যথার্থ ট্র্যাজেডি হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারায় নীলদর্পণ।

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী। এই নাটকে তার সমসাময়িক মধুসূদনের প্রভাব বহুলাংশে চোখে পড়ে। যদিও এই নাটকের নাট্যবস্তু নেহাতই মামুলি – কতকটা রূপকথার তুল্য। রাজা রমণীমোহন মাতা ও দ্বিতীয়া পত্নীর প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠা মহিষীকে পরিত্যাগ করলে গর্ভবতী রানি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন অবলম্বন করেন। যথাকালে তার বিজয় নামে এক পুত্রসন্তান জন্মে। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিজয় সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনীর প্রেমে পড়ে। এদিকে কামিনীর সহিত রাজা রমণীমোহনের বিবাহের তোড়জোড় চলছিল। ঘটনাচক্রে বিজয়ের পিতৃপরিচয় উন্মোচিত হল। রাজা জ্যেষ্ঠা মহিষীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। বিজয় ও কামিনীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। নবীন তপস্বিনী অত্যন্ত অপরিণত এক নাট্যরচনা। কাহিনির উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে না পারায় সমগ্র বিষয়টিই এখানে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত। এমনকি যার নামে এই নাটকের নামকরণ ‘নবীন তপস্বিনী’, সেই কামিনীর চরিত্রটি পর্যন্ত নাটকে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। দীর্ঘ ক্লান্তিকর বক্তৃতা ও মাঝে মাঝে পয়ার ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার নাটকের গতি শ্লথ করেছে। একমাত্র জলধরের কৌতুকরস এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যদিও এটি শেক্সপিয়রের হলফাস্টের অনুকরণের রচিত।

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় রোম্যান্টিক নাটক কমলে-কামিনী তার জীবনের শেষ নাট্যকীর্তিও বটে। এই নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্বে কর্মসূত্রে দীনবন্ধু কাছাড়-মণিপুর অঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। সেই অঞ্চলের পটভূমিকায় এক কাল্পনিক কাহিনির আধারে কমলে-কামিনী রচিত। কাছাড়ের রাজসিংহাসনে ব্রহ্মরাজের শ্যালক অধিষ্ঠিত হলে মণিপুররাজের সহিত ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে মণিপুররাজ শিখণ্ডীবাহনের প্রেমে পড়েন ব্রহ্মরাজকুমারী রণকল্যাণী। এই প্রেমকাহিনিই মূল নাটকের উপজীব্য। এই নাটকে এমন কিছু নাট্যদৃশ্য আছে যা মঞ্চে অভিনয় করা দুরূহ। আবার হাস্যরস সৃষ্টিতেও দীনবন্ধুর ব্যর্থতা এই নাটকের নাট্যরস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে।

লীলাবতী একটি সামাজিক নাটক। এর কাহিনীজাল অত্যন্ত জটিল। কলকাতার সম্পন্ন গৃহস্থ হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায় ও তার সন্তানদের দ্বন্দ্ব জটিল জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই কাহিনী। ললিত ও লীলাবতীর প্রণয় কথাই নাটকের মূল উপজীব্য। তবে সাধারণ নাগরিক জীবনের এমন রোম্যান্টিক উপস্থাপনায় নাটকের বাস্তবতা আদৌ রক্ষিত হয়নি। যদিও এই নাটকে বিষয়বস্তুর রহস্যঘনতা আছে, সংঘাত ও আকস্মিকতা আছে, এমনকি শেষের দিকে যথেষ্ট গতিও সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আদিরসভিত্তিক কাহিনী ও রসসৃষ্টির ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত কাহিনীকে স্বার্থকতাদান থেকে বঞ্চিত করেছে।

প্রহসন

বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) নাটকটি ১৮৭২ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এটি সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে রচিত। এ প্রহসনে বিবাহবাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অপরিপক্ব ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করে, সে কাহিনিই এ প্রহসনের বিষয়। সধবার একাদশী ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত একটি প্রহসন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরা পান ও বেশ্যা বৃত্তি যুবকদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এই সামজিক বিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে প্রহসনটি রচিত। তার রচিত আরেকটি প্রহসন হল জামাই বারিক (১৮৭২)।

কাব্যসাহিত্য

সুরধনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬)

দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

অন্যান্য রচনা সম্পাদনা

নীল দর্পন এর উপসংহার

দীনবন্ধু মিত্র সাতটি নাটক ও প্রহসন লিখেছিলেন। ‘নীলদর্পণ’(১৮৬০), ‘নবীন তপস্বিনী’(১৮৬৩), ‘কমলে কামিনী’(১৮৭৩)- এই তিনটি তাঁর গভীর রসের নাটক।

আর চারটি প্রহসন হল ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’(১৮৬৬), ‘সধবার একাদশী’(১৮৬৬) ‘লীলাবতী’(১৮৬৭), ‘জামাই বারিক’(১৮৭২) । এর মধ্যে ‘সধবার একাদশী’ তাঁর ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।[৫]

মৃত্যু

দীনবন্ধু মিত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানিজনিত কারণে ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।